পটুয়া শিল্প

যামিনী রায়

বাংলার চলিত চিত্রকলার সাধারণ বর্ণনা দিয়ে শুরু করা যাক।

চিত্রকলা বাংলাদেশে চলিত ছিল দু-ভাবে; এক হল ঘরোয়া বা আটপৌরে শিল্প, আর এক হল পালাপার্বণের শিল্প যাকে পোশাকী শিল্প বলা যায়। বাংলা দেশের আটপৌরে ছবি তার পটের ছবি, আর তার পালাপার্বণের শিল্প দেবমূর্তি, প্রতিমা, ইত্যাদি। এ দুয়ের পার্থক্য স্পষ্ট প্রথমটিতে প্রসাধনের প্রচেষ্টা নেই, সংস্কারের উৎসাহ নেই। দ্বিতীয় ছবি সংস্কৃত, আভিজাতিক। বেদাদি ঐতিহ্যে তার নির্ভর। গঠনের দিক থেকে এই দু-জাতের ছবির বহু প্রভেদ।

পটুয়া শিল্প বলতে দেশে কয়েকটা কুসংস্কার আছে। অনেকে মনে করেন যে পটুয়া ছবি আর কালিঘাটের ছবি দুটি শব্দই একার্থবাচক। এমন নয় যে এ-কথার পেছনে কিছুমাত্র সত্য নেই; যদিও সত্য যা আছে তা নেহাতই অল্প। কলকাতা শহর যখন সবে গড়ে উঠছে তখন গ্রামের একদল লোক কালিঘাটে এসে বাসা বাঁধল এবং ছবি এঁকে চলল। এরা ছিল গ্রামের শিল্পী, সেখানে গড়ত প্রতিমা। কিন্তু নগর-সভ্যতার সংস্পর্শে কিছুটা পরিবর্তন তাদের মধ্যে আসতে বাধ্য হল। কারণ, এরা আঁকতে শুরু করল শহরের চাহিদা মেটাতে—শহর বা শহরের আশেপাশে যে মেলা বসত, সেখানেই তারা ছবি বিক্রি করত। এই ভাবে নগরজীবনের সংস্পর্শে আসার দরুন, নগরজীবনকে অবলম্বন করে আঁকার দরুন, সে-জীবনের ছাপ এতে এসে পড়ল। এ ছবি তাই আসল পটুয়া ছবি নয়; এর ভাষা রয়ে গেল গ্রাম্য, এর বক্তব্যে এল শহর। প্রসঙ্গ আর আঙ্গিকের মিলন তাই সম্পূর্ণ নয়। আদর্শ বিচ্যুত হল ছবি। বিদেশের সমালোচকরা ছবি সংগ্রহ করেছেন প্রধানত কালিঘাট থেকে। নানান কারণে এর বেশী তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই, তাঁরা যে কালিঘাটের ছবির সঙ্গে পটের ছবিকে অভিন্ন মনে করবেন তাতে বিস্ময়ের অবকাশ অল্প। কিন্তু দুঃখের কথা দেশের সমালোচকও প্রায়ই বিদেশীদের ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি তোলেন।

যে ছবি আসল পটুয়া ছবি, ইংরেজ আগমনের বহু পূর্বে কলকাতা শহর গড়ে উঠবার অনেক আগে, বাংলায় তার প্রচলন ছিল। বরং বিদেশীদের আগমনের অনেক

আগেই তার দেহে প্রকৃত প্রাণ ছিল। যে আদিম শিল্পীদল বহুদিনের প্রচেষ্টায় এই ছবির মূল গড়ন ও বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিল তাদের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। কারণ ছবির জগতে যে কথাটা ধ্রুব সত্য, এরা তার সন্ধান পেয়েছিল। তারপর অবশ্য, দিন যত গেল, পটের ছবি বাংলা দেশে চলিত রইল পটুয়ামহলের নিছক অভ্যাস হিসেবে, এবং শিল্পীরা হয়ে রইল অজ্ঞানেরও অধম। বাংলাদেশে লোকশিল্পের প্রথম যে বোধ এসেছিল সে-বোধ আজকের পটুয়ারা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু, যে শিল্পীসম্প্রদায় এ-বোধ প্রথম পেয়েছিল তারা এত পাকা ভিত্তির উপর একে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল যে বাংলাদেশ আজও অন্তত অভ্যাস হিসেবে, তার জের টেনে চলেছে, তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারে নি। পটুয়া শিল্পের মূল তথ্যকে তাই শুধু বাংলা দেশের ছবির ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় বললে কমিয়ে বলা হবে। শিল্প-ইতিহাসেরই এটা মূল কথা, সমস্ত দেশেই প্রাগৈতিহাসিক ছবির মধ্যে এই ধরনের বক্তব্যের বিকাশ হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশে অন্যপথে হয়েছিল বলেই কিছুদিনের মধ্যে তার ধারা শেষ হয়ে গেল। শিল্পের মূল রহস্য কি তা জানতে হলে যে-কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবি বা বিশেষ করে বাংলা দেশের প্রাকৃত পটুয়া ছবিকে বিশ্লেষণ করতে হবে; কারণ ছবির মূল সত্যের সন্ধান এখানে এসেছিল।

সব ছবিরই দুটো দিক থাকে, বলবার কথা আর বলবার ভাষা। প্রসঙ্গ আর আঙ্গিক। মূল পটুয়া ছবিকে দু-দিক থেকে দেখলেই বোঝা যাবে কেন একে শিল্পসাধনার অনিবার্য অধ্যায় বলতে হবে এবং কেন বলতে হবে শিল্পের সত্য এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পটুয়া শিল্পের বলার কথাটা কি? নিঃসন্দেহে বিশ্বপ্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি নয়, অথচ প্রকৃতির মূল কথাটুকু দেওয়া নিশ্চয়ই। বিশ্বপ্রকৃতির সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল এ ছবির উদ্দেশ্য। তাই, পটের ছবিতে একটা গাছ দেখলে বুঝি যে ওটা গাছই, তবু এ-গাছ কোনো-গাছের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেবার উপায় নেই। অর্থাৎ গাছের সামান্য সংবাদটুকু আছে মাত্র, বিশেষ গাছের গ্লানিটা নেই। এদিক থেকে যে-কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে মূল পটুয়া ছবির মিল অনেকখানি। অন্যত্রও শিল্পীর আবেগ নির্ভর খুঁজেছে বস্তুর সামান্য-স্বরূপে। তবু অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে মূল পটুয়া ছবির তফাৎও আছে : প্রথমত, মূল পটুয়া ছবির আবেগ দানা বেঁধেছিল একটা পুরাণের উপর। ('পুরাণ' শব্দে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের সমাজ-উৎসৃত Myth বোঝাতে চাই।) দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকের দিক থেকে, পটুয়া ছবির পাশই দেশে ছিল সংস্কৃত শিল্প।

পটুয়া ছবি দানা বেঁধেছিল একটা পুরাণের উপর। এমনটা আর কোনো প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে হয় না এবং এমনটা না হলে শিল্পীর একটা প্রধান সমস্যারই সমাধান হয় না। অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক চিত্র কোনো নাচের ছন্দ এঁকেছে,

কোনো মানুষ এঁকেছে, কোনো হরিণ এঁকেছে। কিন্তু খাপছাড়া ভাবে। সব মিলে একটা জগৎ নয়, এবং কোনো পুরাণে বিশ্বাস নেই। বাংলার প্রাচীন পটুয়ারা কিন্তু এমন একটা জগতের সন্ধান পেয়েছিল যে জগৎ আগাগোড়া সামান্য-লক্ষণের জগৎ, এবং একটা পুরোপুরি সংহত পুরাণের উপর যার স্থিতি। সেখানে যে জটায়ু সে তো আর মরলোকের কোনো বিশেষ পাখি নয়, অথচ পাখির মূল কথাটা তার মধ্যে রয়েছে। সেখানে যে হনুমান সে তো আর কোনো দৃষ্ট বানর নয়; তার জন্ম-ইতিহাস, তার ক্রিয়াকলাপ, এর কোনোটাই মরলোকের নয়। তবু বানর বলে তাকে চিনতেও ভুল হয় না। আর সেই জটায়ু, সেই বানর, সেই রাক্ষস সবের মধ্যে আশ্চর্য সংহতি। পুরাণের জগৎ মরলোকের জগৎ নয়; সামান্য-লক্ষণের জগৎ, তবু সংহত জগৎ। আর পটুয়া শিল্পীদের বিশ্বাস এই জগতেই দানা বেঁধেছিল।

শিল্পের পক্ষে এই জাতের একটা পৌরাণিক জগতে বিশ্বাস করবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এখানে শুধু একটা উদাহরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় : ইওরোপের সংস্কৃত-শিল্প যতদিন খ্রীস্টের পুরাণে বিশ্বাস অটুট রাখতে পেরেছিল, এবং যতদিন পেরেছিল ততদিন অশান্তি জোটেনি। রেমব্রান্টের পর দেখা গেল সামাজিক অবস্থার প্রভাবে উক্ত পুরাণে বিশ্বাস আর টিকিয়ে রাখা কঠিন। শিল্প পুরাণ ছাড়ল কিন্তু এল অশান্তি। গগাঁ ও ভ্যানগগ্ গ্রামের সরলতা ও খ্রীস্টের পুরাণ আঁকড়াবার শেষ চেষ্টা আবার করলেন, কিন্তু সম্ভব আর হল না। পশ্চিম ইওরোপের সাম্প্রতিক শিল্পে প্রকাশ কোনো জীবন নির্ভর বাস্তব পৌরাণিক বিশ্বাসের জন্যে মরিয়ার মতো সন্ধান, অথচ, সে আধুনিক মনে কোনো জীবন-পুরাণই আর ধরছে না। তাই অশান্তির শেষ নেই। মূল পটুয়া ছবির পুরাণ-নির্ভরতা তাই লক্ষ্য করবার। যদিও উত্তরকালে এ-বিশ্বাস নেহাৎ অভ্যাসে পরিণত হবার পর শিল্পীর দল যখন গতানুগতিকে পট এঁকে চলল, তখন এ ভিত্তি তারা বিস্মৃত হয়েছে অভ্যাসের অন্ধকারে।

এই তো গেল বলার কথা; এবার বলবার ভাষা নিয়ে আলোচনা করা যাক। তাদের পৌরাণিক জগতের কথা বাংলার পটুয়ারা বলতে শিখেছিল আশ্চর্যরকম ঘরোয়া ভাষায়। তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই, সূক্ষ্ম কারিগরি নেই, বিলাসের চিহ্ন নেই; অথচ, এই আটপৌরে ভাষার পাশেই আমাদের দেশে ছিল সাধুভাষার শিল্প, যাকে বলেছি দেশের পোশাকী শিল্প; দেবতার মূর্তি, মন্দিরের কারুকার্য, সভাগৃহের চিত্র, গ্রামের পালাপার্বণে গড়া প্রতিমা। তার ভাষা গম্ভীর, তার দৃষ্টি শৌখিন, তার ভঙ্গি অতি সংস্কৃত। তবুও পটের ছবি সজ্ঞান ছিল না। কথাটার গুরুত্ব কম নয়। সত্যি কথা, জ্ঞানের কথা অনেক সময় অনেক শিশুও বলে থাকে; তবু যতক্ষণ দেখা যায় এ কথা অজ্ঞানে বলা হয়েছে ততক্ষণ তার মূল্য দিতে আমরা নারাজ। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের কথাকে আসল বলতে আমরা রাজি সে-কথা যখন সচেতন। ছবির বেলাতেও তাই।

প্রাগৈতিহাসিক ছবি, ছোট ছেলের আঁকা ছবি, অনেক সময় শিল্পের আসল সত্য প্রকাশ করে, বিষয়ের সামান্য-রূপ এঁকে দেয়। তবু তার মূল্য শেষ পর্যন্ত অনেক কমে যায়। কারণ এখানে সত্য কথা সজ্ঞানে বলা হয় না। পটুয়া ছবিতেও তা বলা হয় নি, যদিও পটুয়া ছবির দুটো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, পটুয়ারা সংহত কোনো পৌরাণিক জগতে স্থিতি পেয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় বাকি সব জায়গাতেই প্রাগৈতিহাসিক ছবি লুপ্ত হয়ে গেছে, পটুয়া ছবি সম্পূর্ণ মরে নি। দ্বিতীয়ত, পোশাকী ছবিতে ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পী প্রমাণ রেখে গিয়েছিল যে শৌখিনতায়, সূক্ষ্ম কারুকার্যে, নিখুঁত করার কাজে, পালিশ করার কাজে, তারা কম দক্ষ ছিল না। তবুও উৎসবাদি ছাড়া শিল্পের প্রকৃত দৈনন্দিন জীবনে এর মূল্য নেই। একমাত্র পালাপার্বণেই মানুষ মেকি সাজতে পারে। ফলে পটের ছবিতে গৃহস্থ পাড়ার ভাষায় কথা বলবার ভঙ্গি দক্ষতার অভাবে নয়, সংস্কৃত ছবি আঁকবার কথা জানা ছিল না বলে নয়।

আর কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী এ অবস্থা পায় নি—না ছিল তাদের পৌরাণিক জগতে স্থিতি, না জানত তারা পোশাকী ছবির ভাষা। আর তাই, শিল্পের সত্য অজ্ঞানে আবিষ্কার করেও তাকে ধরে রাখতে ওরা পারল না। সভ্যতার অগ্রসর হলে চাকচিক্যের প্রবল আকর্ষণে সে-শিল্প ভেঙে পড়ল, শৌখিনতার প্রখর আলোয় চোখে লাগল ধাঁধা। শিল্পীর দল কোমর বেঁধে নেমে পড়ল পালিশ করার কাজে, শিল্পের আসল কথা গেল ভুলে। আমাদের দেশে যাকে বলে বিভূতির আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হওয়া অনেকটা সেই রকম। ছবি নিখুঁত হল, ছবিতে পালিশ এল—এত নিখুঁত, এত সংস্কৃত যে কল্পনা করাও কষ্টকর। আঁকা আঙ্গুরকে সত্যি আঙ্গুর বলে ভুল করে পাখি পর্যন্ত ক্যানভাস ঠুক্‌রেছে, এত নিখুঁত। যোগশাস্ত্রে বিভূতি-দর্শনে যেমন নেশা ধরার কথা শোনা যায়, শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি এই সংস্কার করার নেশাও কম নয়। যতদিন এ-নেশা ছিল ততদিন বেশ ছিল। তারপর, শিল্পসাধনায় এই দীর্ঘ ইতিহাসের পর, এতদিনে ইউরোপীয় শিল্পীদের আজ হঠাৎ টনক নড়েছে, নেশা ভেঙেছে। সংস্কৃত করার পথে এর বেশী তো যাওয়া যায় না। এর পর কী? শিল্পী চলবে কোন্ পথে? ওরা দেখলে এখন সব পথই প্রায় রুদ্ধ। অনেকটা দাবা খেলার মতো। যতক্ষণ খেলবার নেশা ছিল ততক্ষণ আলাদা কথা, কিন্তু হঠাৎ এমন জায়গায় এসে পড়েছে যে পথ আর নেই। যে পথেই যেতে যায় মাৎ হয়ে যায়। এদিকে খ্রীস্টের পুরাণে বিশ্বাসও ক্ষয়ে গেছে এবং আর কোনো পুরাণও খুঁজে পাচ্ছে না। ওরা তাই সমস্ত খেলার ছক লণ্ডভণ্ড করে ভাঙতে চায়, যে চাল এতদিন দিয়ে এসেছে সে সমস্ত চাল ফিরিয়ে নিতে চায়। আজকের ইওরোপীয় শিল্পে এই ভাঙনের রূপ প্রত্যক্ষ। ওরা যদি গোড়া বেঁধে খেলতে শিখত তাহলে এ অবস্থা নিশ্চয়ই হত না।*

* শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত।